সাহিত্য সরণী

শ্রী প্রসিত রায়চৌধুরী

শিকার ভ্রমীর

কিংবিতরাড় অভীষ্ট শি

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII vide Notification No. TB/76/TB/77 and also Board's letter No. RB/76DS/1 dated 24. 12. 76.

সাহিত্যসরণী

দ্বিতীয় ভাগ

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

কবি, সুলেখক ও আকাশবাণীর বক্তা

ডঃ প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী এম. এ., পি. এইচ. ডি.

শিক্ষক, বঙ্গভাষা-বিভাগ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-বিদ্যালয়, প্রাক্তন-শিক্ষক হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয় ও রাজপুর বিদ্যানিধি বিদ্যালয়; বঙ্গ-সংস্কৃতি কথা, আকাশ, পৃথিবী, বিক্ষত হৃদয় ও সাহিত্যসরণী ১ম ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

প্রণীত

গ্রন্থলোক

৫৮/৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশিকা :
রীণা চন্দ
৫৮/৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :
প্রগতি লাইব্রেরী
৮বি, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮২

মূল্য : ৪ ৪২

মুদ্রণে :
সত্য প্রিন্টার্স
৪৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

গদ্যাংশ



একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠন্‌ঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়,

এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর আজ বুঝিবা তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

পিতামহদেবের দেহত্যাগের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম।...বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ

সংসারের কর্ত্তা। এই সময়ে জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্য শব্দে সম্ভাষণ করিতেন। সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদামহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে বড়দিদি ও ছোটদিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে

সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছুদিন তাঁহার জন্য, যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশ নিবারণ হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। 'আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' কথাগুলি কাহার? তিনি কাহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্ত্রীজাতির প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাহা ঘটনার সাহায্যে বিবৃত কর।

২। টীকা লিখ :—ভাগবতচরণ সিংহ, ঠনঠনিয়া, রাইমণি, ফলার।

৩। অর্থসহ বাক্য রচনা কর :—অপ্রতিম, কস্মিন্‌কালে, নিরীক্ষণ, দেহাত্যয়, হৃদয়বিদারণ, কৃতঘ্ন, উপাখ্যান, উৎকট।

৪। পদ পরিবর্ত্তন কর :—সৌজন্য, আশ্বাস, তৃষ্ণা, বাৎসল্য, উৎকণ্ঠিত।

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—উল্লেখ, দুঃখানল, অদ্ভুত, সদ্বিবেচনা, নিরীক্ষণ।

৬। লিঙ্গান্তর কর :—নারী, ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, পিতৃদেব, স্বামী।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—অস্থির, প্রজ্বলিত, দুঃসহ, আদর, সত্বর।

৮। নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন।

(খ) কিছু মুড়কি ও জল দিলেন।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম কর।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?



লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পারের তিনদিকে নিবিড় বন। এ বনে বড় বড় বনস্পতির নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্যবশতই হোক বা যে জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা বন্য পুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকের বহুদূর প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। বামে চাইলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে। দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটিতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়েয় দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎ-স্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখির কূজন শুনিতে শুনিতে মন কতদূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খররৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমনভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ ফল আমার প্রায় বুকেয় উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন, নিবিড় সুবাস সে-ফুলের!

সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা। এত পাখিও আছে এখানকার বনে! কত ধরণের, কত রংবেরঙের পাখি—শ্যামা, শালিক, হরটিট,

বনটিয়া, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখি, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখি—পাখির কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাসভরা অবাক কূজনে কানপাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারিপাশে হাত দেড়-দুই দূরে তাহারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই ?

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটি হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ। হরিণশিশুটির চোখে ঠিক যেন মনুষ্য-শিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না। আমার ঘোড়াটা সে সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

রোদ ক্রমশ রাঙা হইয়া আসিল। ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল। পাখির কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেজি খানিক দূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিনঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখির কাকলি ছাড়া আর কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখিদের পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুক্‌রা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোনদিকে।

অনুশীলনী

১। সরস্বতী কুণ্ডীর বন্য পরিবেশটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। "সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা"....পাখির আড্ডা বলা হইয়াছে কেন? তাহার বর্ণনা দাও।

৩। "ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণ-শাবক"—এই হরিণ-শাবক তিনি কখন দেখিলেন? তখন হরিণ-শাবক কি করিল?

৪। অর্থ লিখ:—শৈলচূড়া, জলজ, সুদূরবিসর্পী, নির্বাক, মগডাল, সান্নিধ্য, স্তব্ধ, কলেবর।

৫। বাক্য রচনা কর:—চকিত, জড়াজড়ি, থোকা থোকা, মচ্‌মচানি, বিস্তীর্ণ, সমাবেশ, আড্ডা।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:—উগ্র, ঘন, প্রকাণ্ড, শীর্ষদেশ, নিবিড়, প্রসারিত।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—বনস্পতি. সরস্বতী, চন্দ্রাকার, ঘর্মাক্ত, স্বচ্ছ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকখানি উপন্যাসের নাম লিখ।

[illegible]

অনধিকার প্রবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজী রাখিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীর মাধবী বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, তাহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গীও কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটকথা বা নাকী কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে-সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না।

ঠাকুরবাড়ীটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন, বসন, স্নানাহারে তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ, দুটি দেবতা অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশী ভয় করিত।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকোচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিত না।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে, যে বালকটি মন্দির প্রাঙ্গণ

হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত ; তথাপি তাহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীলতায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভারে জীর্ণমঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্ত্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতর কণ্ঠে ছল-ছল নেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে যে কেহ খাদ্য দিবে, বাড়ীতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চ সংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।"

নলিনের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় আর একটি জীবের ভীত কাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্ত্তী চিৎকার-শব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্য্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে। সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন্"।

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, নলিন বন্দিশালা হইতে কোন-ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট গিয়া পুনরায় ডাকিলেন—"নলিন্"! উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিঃশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দী তীরবর্ত্তী সুখ-বিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চিৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিসনে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। গল্পটি আপন ভাষায় লিখ।

২। নলিনকে প্রহার, আবার শূকরকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে জয়কালী চরিত্রের বিচার কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) যে লতা বিতান···ব্যাপার ঘটিল।

(খ) ইহা হইতেই···সীমা ছিল না।

৪। অর্থসহ বাক্য রচনা কর :—অসমসাহসিক, মাধবীবিতান, নিরলস, তক্‌তক্‌, বল্কাংশ, আহরণ, বিকচোন্মুখ, মুহুর্মুহু, আর্তকণ্ঠ, ভূমিসাৎ।

৫। পদান্তর কর:—

পারিপাট্য, পবিত্রতা, পৌরুষ, নিঃশেষিত, প্রসারিত, উত্থিত।

মৌখিক প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের আর কোন ছোট গল্প পড়িয়া থাকিলে নাম কর।



আজিকালি বড় গোল শোনা যায় যে, আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের দেশের মঙ্গল হইতেছে।

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দুইটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? ভাদ্রের রৌদ্রে উহাদের মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে। ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়; সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙা পাথরে রাঙা রাঙা বড় বড় ভাত লবণ-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের

ভূমে একপাশে শয়ন করিবে। উহাদের মশা লাগে না। পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে।

ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।

দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কজন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। যেখানে তাহাদের নঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

এখন রাজ্য সুরক্ষিত। দস্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎ কর্তৃক দুর্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিত অর্থসংগ্রহ-লালসায় যে ছলে বলে কৌশলে লোকের সর্বস্বাপহরণ করিবেন সেদিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থার্জনের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। সেখানে প্রজাবৃদ্ধি ঘটে। ফল, কৃষি-কার্যের বিস্তার। যে দেশের লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজনাভাবে কেবল তদুপ-যুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে। কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা

তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোক মাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড়লক্ষ কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে, যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ— বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি বিদেশের বস্ত্র লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী বিদেশে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য পাঠাইতে পারি। বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে ঐ সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে ; সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে।

চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে একশত বিঘা জমি চাষ করিয়া বার্ষিক একশত টাকা পাইয়া থাকি, তবে দুইশত বিঘা চাষ করিলে ন্যূনাধিক দুইশত টাকা পাইব।

আর একটি কথা আছে। সকলে মহা দুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এখন দিনপাত করা ভার— দ্রব্যসামগ্রী বড় দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়। বাস্তবিক দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দুর্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটা মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, আগে আট আনায় একমণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন অনেক টাকা লাগে। কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে, বস্তুত চাউল দুর্মূল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে ইহাই বুঝায়। ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক আগে একটাকা উৎপন্ন করিত, সে-

ভূমিতে এখন অনেক টাকা উৎপন্ন হয়। সেই কারণে এদেশে কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের প্রচুর বৃদ্ধি হইয়াছে।

মোটামুটি দুইপ্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য। পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, ইহা কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। কতক বণিকেরা পান, কতক মহাজনেরা পাইয়া থাকেন। কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পাইয়া থাকে?

আমরা এমন বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দুবিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হয় না, ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষক পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যাহার ধন তাহার ধন নয়। যাহার মাথায় কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে প্রধান হইল না।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার কথা নিজের ভাষায় লিখ।

২। কি কি কারণে চাষ বৃদ্ধি হয়? লেখকের যুক্তি অনুযায়ী চাষবৃদ্ধির ফলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় কেন?

৩। ব্যাখ্যা লিখ:—(ক) এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে....কাহার এই মঙ্গল।
(খ) দেশের মঙ্গল....দেশের কয়জন?

৪। বাক্য রচনা কর:—
অস্থিচর্মবিশিষ্ট, চশমা-নাকে, হুলুধ্বনি, বিন্দুবিসর্গ, কণামাত্র, কালঘাম।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী লেখক বলা হয় কেন? তাঁহার কোন বই তুমি পড়িয়াছ কি?

২। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতটির প্রথম ছত্রটি কি?



ভারতের বাণিজ্য

স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্যে যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয়. ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হইতে উর্বরতায়, আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তূলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তাছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি, পশমিনা, কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করত। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান

ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে, আর-একটি জলপথে রেড্-সি হয়ে। সিকন্দর শা, ইরান-বিজয়ের পর, নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্ত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস (ক্রিষ্টোফার কলম্বাস), আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায় নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই-জন্যেই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত।

এদিকে পোর্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয় হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড়ো জাত। তবে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না, ভারত যে তাদের ধন-সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতে চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব? ভেবে দেখো কথাটি কী। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য

বিজাতিবিজিত স্ব-জাতি-নিন্দিত ছোটজাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস্ জেনোয়া, বাগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি? কে ভাবে একথা। যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি —তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা। বড়ো কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমরা— ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!—তোমাদের প্রণাম করি।

অনুশীলনী

১। "মানবজাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্যে যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান।"—আলোচনা কর।

২। টীকা লিখ:—নিয়ার্কস, কিংখাব, জেনোয়া, কলম্বাস, পশমিনা।

৩। ব্যাখ্যা লিখ:—(ক) যাদের রুধিরস্রাবে…গুণগান কে করে?

৪। বাক্য রচনা কর:—আবহমানকাল, রুধিরস্রাব, নিষ্কাম, চির-পদদলিত।

মৌখিক প্রশ্ন

১। স্বামী বিবেকানন্দের মত আরও কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত মানবপ্রেমিকের নাম কর।

জগতে ভারতের দান

—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানবসমাজের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত-সন্তানেরাও তাহা ভাবিয়া দেখেন কিনা সন্দেহ। আমরা জানি যে, বর্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ য়িহুদি হইতে ধর্ম, রোমের নিকট হইতে রাজনীতি এবং গ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভূমণ্ডলে উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছে, আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্তমান সভ্য জাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞানের মূল; বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে-শাখা যে-পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

অধিকাংশ সভ্য জনপদে অধুনা যে সংখ্যা-লিখন-প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টি অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসিদিগকে পাটীগণিতের স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসিদিগের সৃষ্টি। বর্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকট পাইয়াছেন, বীজগণিতের Algebra নামটি আরবী "আল্‌জিবর" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালী দেশীয় এক ব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকট বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। আরবেরা যে বীজগণিতের স্রষ্টা নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দু এবং গ্রীক জাতির ছাত্র। পূর্বে ভারতবর্ষে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি বীজগণিতকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি আরবদেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন তিনি যে ভারতবাসীদিগের শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহম্মদ বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন বলিয়া পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন এবং এতদ্দেশীয় সংক্ষিপ্ত গণনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবাসীদের নিকট ঋণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা করে নাই, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকট ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্তমানকালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় Chemistry বা রসায়ন Alchemy হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু Alchemy (আলকেমী) নামটি আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়েও

জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক ও সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়, এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকট আপনাদের ঋণ স্বীকার করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদশাহ হারুণ-অল-রশিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিল। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ নহে, তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন।

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটি নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটি বর্ণমালা আছে। চীন দেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদি, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব উপদ্বীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু ধর্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য-সমাজের মহদুপকার করিয়াছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে এদেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎমণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্বভৌম ধর্ম প্রথম প্রচার করেন। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া তুষারমণ্ডিত মেঘভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল; সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম আহরণ করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। পূর্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবাসীগণ পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে য়িহুদী, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্যসমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে, কার্পাস শিল্পজাতের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে ঋগ্বেদ প্রায় খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্বে লিখিত, তাহাতেও তন্তুস্থিত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীনকালেও এতদ্দেশে কার্পাসবস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন, তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্যজাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

১। জগতের বিজ্ঞান সাধনায় ভাবতবর্ষের অবদান সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্র ন্ধ রচনা কর।

২। ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের বাণিজ্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। টীকা লিখ :—চরক, সুশ্রুত, লিওনার্ডো, আর্যভট্ট, বরাহমিহির।

৪। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে শাখা....উন্নতি লাভ করে।
(খ) সমুদ্র পার হইয়া....গতিরোধ করিতে পারিল না।

৫। বাক্য রচনা কর :—তুঙ্গশৃঙ্গ, সার্বভৌম, সমুৎপন্ন, তমসাচ্ছন্ন, পারদর্শী।

৬। পদান্তর কর :—প্রাদুর্ভূত, প্রচলিত, প্রেরণ, সমালোচনা, দৃষ্ট।

মৌখিক প্রশ্ন

১। আধুনিককালে কোন্ কোন্ ভারভীয় মনীষীর সাধনায় মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ করছে?

ছাত্রের তপস্যা

—সুভাষচন্দ্র বসু



তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড় হইয়াই জন্মায়—তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড় হইতে হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহাপুরুষেরা মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহারা সে মহত্ত্বের বিকাশ করিতে পারেন না বা সর্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ কয়িয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম। তোমরা যদি সেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করিতে পার তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য-সমাজকে মুগ্ধ করিবে।

এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মত সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষা-দীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে—সে ব্যক্তির দিবার মত

সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন, হীন, তাহার দানের কোনও অর্থ নাই ; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয়—এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

ইংরাজ—তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে, তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে দেখিবে যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের Spirit of Adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে ; বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে ; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা ও গতিশীলতা আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত ; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মবিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সঙ্কোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি ; পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে, তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ

চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা কিছু আছে বিশ্ব-দরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর, পালোয়ান—পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বারবার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা জাতিহিসাবে এখনও অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব, সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ-সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডি অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণ-সমাজ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য ছাত্র-জীবন হইতেই সাধনা করা চাই।

মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে, সেইখানে নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বর্তমান যুগে আত্ম-রক্ষার এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে-জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না—পাইব নিষ্কাম কর্ম-যোগের দ্বারা—পাইব আবার সংগ্রামের ভিতর দিয়া। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি মনুষ্যত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয়—সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ, কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন ; কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময় লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্য-প্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয়—দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্র লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনও দিন পায় না। আত্মীয়-স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত, বিবেক প্রণোদিত হইয়া বিরোধ

করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনের অবস্থার মত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা কর।

অনুশীলনী

১। কিভাবে ও কোন্ পথে জগতের মহাপুরুষগণ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন তাহা আলোচনা কর।
২। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত জাতির উন্নতির কারণ কি?
৩। "এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত।" লেখক এই কথা কেন বলিয়াছেন?
৪। সামাজিক বিপ্লবের কার্য রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কার্যাপেক্ষা কেন কঠিন তাহা আলোচনা কর।
৫। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে···মুগ্ধ করিবে।
(খ) মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র···চূর্ণ-বিচূর্ণ করা।
৬। বাক্য রচনা কর :—ভস্মাচ্ছাদিত, সুপ্তিভঙ্গ, আন্তর্জাতিক।
৭। পদান্তর কর :—শক্তি, মনুষ্যত্ব, জাগরণ, পঙ্গু।
৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—উন্নত, জ্ঞানালোক, নিষ্কাম।
৯। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—জাগরণ, সঙ্কোচন, অসীম, শীর্ষ, নিকৃষ্ট।
১০। নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।
(ক) তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর।
(খ) আমারাও একদিন দেশ-দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি।
১১। টীকা লিখ :—কুরুক্ষেত্র, অর্জুন, ইংরাজ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ কে ছিলেন?
২। নিবন্ধটিতে সুভাষচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, নিজের জীবনে তাহা কতখানি প্রয়োগ করিয়াছিলেন?

প্রাচীন ভারতের গৌরবময়, বর্তমান ভারতের দুঃখদুর্দশা
[illegible]

মুক্তিপথের অগ্রদূত

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ-সাত জন পুলিস-কর্মচারী সাদা পোশাকে পূর্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিল। নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগত প্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে।

জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিঙ্ ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।--ডেকের উপর ব্যগ্রতা। কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই,—হয়ত ইহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই। যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে!

জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল। কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল। নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে

সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একান্ত মনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে। কৌতূহলী নরনারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না, তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও।--তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ। তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না। সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ। দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়।--কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল। কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী। এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার!

এত লোকের ভিড়। এত লোকের আনাগোনা। এত লোকের চোখের দৃষ্টি, কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না।—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি

হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন। কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না। বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই। পালিয়েছে।

কি করে পালালো ?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জান্‌বো ত সে কি পালায় ? প্রায় শ'তিনেক যাত্রী—বিশ পঁচিশটা সাহেব, ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, তাও শ'দেড়েক হবে, বাকী বর্মী—সে যে কার পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা' দেবা ন জানন্তি—বুঝলে, বাবাজী—আমরা ত পুলিশ। চিনবার জো নেই, তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল সন্দেহ ক'রে জনছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়। কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই—সে নয়। যাবে নাকি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে ?

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে। নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার কোরব ? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা' নয়। ভাল-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে তবে তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না, অপূর্ব।

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন। তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন কোরব, কাকাবাবু! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু

খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে! চল, একটু শীঘ্র যাওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

অনুশীলনী

১। "মুক্তিপথের অগ্রদূত" এখানে কে? তাঁহাকে বিদ্রোহী বলা হইয়াছে কেন? তাঁহার প্রতি অপূর্বের মনোভাবটি কেমন ছিল?

২। কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :—"তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ······কাছে রুদ্ধ।"

৪। টীকা লিখ :—ইরাবতী, ফিরিঙ্গী· বর্মা।

৫। বাক্য রচনা কর :—ঝর্‌ঝর্‌, মারধর, ঝাপ্‌সা, জো, ধড়াস্‌।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—উচ্ছ্বসিত, আশীর্বাদ, উদ্‌গ্রীব, প্রচ্ছন্ন, নমস্কার।

৭। পদান্তর কর :—ব্যস্ততা, উৎসুক, শঙ্কা, বিস্মৃত।

৮। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—আনন্দ, প্রচ্ছন্ন, সোজা, দুঃসহ, শীঘ্র।

৯। নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) তুমি <u>সর্বস্ব</u> ত্যাগ করিয়াছ।

(খ) <u>তোমাকে</u> পদ্মা পার হইতে হয়।

মৌখিক প্রশ্ন

১। আলোচ্য গদ্যাংশটি শরৎচন্দ্রের কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত?

২। তুমি শরৎচন্দ্রের কোন বই পড়িয়াছ কি?

৩। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের নাম বল।

৪। তুমি কি জান, শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প? গল্পটি পড়িয়াছ কি?

লবণ-সত্যাগ্রহ

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—"বন্দে মাতরম্"—

—"মহাত্মা গান্ধীকী জয়"—

—উত্তরাপথের গিরিদুর্গ আর দক্ষিণের নীলসমুদ্র উন্মথিত ক'রে উচ্চারিত হ'ল সঙ্কল্পবাক্য ঃ

"আজ আমরা সঙ্কল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদকদ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ-করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী! দিকে দিকে রুদ্রধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই



একটি নাম। যাত্রা করলেন বে-আইন লবণ-সত্যাগ্রহের নির্ভীক অভিযানে। সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্তকণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন ঃ "মেরা এক কদমসে সারে হিন্দোস্তান উথাল-পাথাল হো জায়গা—"

ওই একটি কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চক্ষের পলকে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল-বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল-পাথাল হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সেদিন কি ভুলবার দিন! ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ

পতাকা, পড়শীর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। অবসান ঘটিয়ে দাও সৌখিন বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানে লজ্জায় জর্জরিত পরের সর্জ্জা দূর ক'রে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয় উষ্ণীষ প'রে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠ।

রাস্তার মোড়ে বিলাতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড় ক'রে তাতে আগুন ধরান হয়েছে। দেশী-বিলাতী মদের বোতল চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায়।

কি আশ্চর্য দিন—কি অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা!

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল-কলেজ থেকে, উকিল-মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা-হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন উর্ধ্ব গগনে মাদল বেজেছে, নীচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণদলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে, "ঝণ্ডা উঁচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল ক'রে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদছন্দ। কোন নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী, মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল। তেড়ে উত্তর এল: জুতি-মার্কা হায়, খাওগে? একখানা বিলাতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল। নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় ক'রে দিল। ষ্টেশনের সামান্য কুলী পর্যন্ত সাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণা বোধ করলে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি।

উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল ষ্টেশনের কুলী থেকে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় পর্যন্ত কেউ বাদ নেই আর। বন্দে মাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমাট বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পার, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে ?

চারিদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়ী-ঘর, কোন কিছুর আজ যেন আলাদা কোন রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোন রকমের, আজ সমস্ত কিছু একরকম হয়ে গেছে—ধরেছে—একটি রঙ—ত্রিবর্ণপতাকার রঙ। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্-ঝিম্ রিম্-রিম্ ক'রে একটা গভীর মধুর সুরের রেশ অনুঝঙ্কৃত হচ্ছে : বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্ !

অনুশীলনী

১। উনিশশো ত্রিরিশ সাল—ভারতের ইতিহাসে কেন স্মরণীয় ? লেখককে অনুসরণ করিয়া সেই সময়ের উন্মাদনার কাহিনী বর্ণনা কর।

২। "কি আশ্চর্য দিন—কি অপূর্ব সেদিনের উন্মাদনা !"—কোন্ দিনের কথা বলা হইয়াছে ? দিনটিকে আশ্চর্য বলা হইয়াছে কেন ? উন্মাদনার কারণ কি ? উহার মধ্যে অপূর্বতা কোথায় ?

৩। টীকা লিখ :—চরকা, মহাত্মা গান্ধী, বন্দে মাতরম্, সত্যাগ্রহ, বয়কট, দাবানল, তকলি।

৪। বাক্য রচনা কর :—ঝিম্-ঝিম্, উথাল-পাথাল, অর্ধচন্দ্র, অনুঝঙ্কৃত।

৫। অর্থ লিখ :—আত্মঘাতী, উষ্ণীষ, মর্মলিপি।

৬। পদান্তর কর :—জর্জরিত, বর্জন, উন্মথিত, নির্ভীক, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত আরো দুইটি আন্দোলনের নাম বল।

জনদরদী বিবেকানন্দ

—রেজাউল করিম



বেদান্তবাদী, আজন্ম সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্তর ছিল চিরনিপীড়িত জনগণের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসায় পূর্ণ। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য তাঁর বীরত্বপূর্ণ অমোঘ বাণী শুনে মুগ্ধ হয়েছে। চিকাগো ধর্মসভায় জলদগম্ভীর কণ্ঠে তিনি যে অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন, তা সমগ্র আমেরিকায় প্রবল কম্পন সৃষ্টি করেছিল। তিনি যখন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির ব্যাখ্যা করতেন তখন মনে হত কি বিরাট পাণ্ডিত্য! বিভিন্ন ধর্মের তুলনা-মূলক আলোচনা যখন করতেন তখন মনে হত কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! আর বক্তৃতা, ভাষণ, তর্কবিতর্ক ও আলোচনার পর যখন তিনি ধ্যানে বসতেন তখন মনে হত যেন সেই প্রাচীন যুগের কোন মহান ঋষিই বুঝি অবতীর্ণ হয়ে এ যুগের মানুষকে ধ্যানের আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ প্রচণ্ড শক্তি, অমিত তেজ, গভীর পাণ্ডিত্য; একনিষ্ঠ সাধনার তিনি ছিলেন মূর্তপ্রতীক।

এ-তো গেল একদিকের চিত্র। এ হল আদর্শবাদের জ্বলন্ত নিদর্শন। এই মহান সাধক অন্যদিকে ছিলেন অত্যন্ত বস্তুবাদী, মানবদরদী, দীন-দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ।

ঠাকুরের একটি বাণী বিবেকানন্দকে জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করেছিল।—খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের

বন্দোবস্ত চাই। বিবেকানন্দ বুঝলেন, ঠাকুরের এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যিই তো ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দিতে চাওয়া মূঢ়তা মাত্র। তিনি বুঝলেন, ধর্ম তাঁদের যথেষ্ট আছে, এখন প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, ঠাকুর যা বলেছেন, তাই তো ধর্মের মূল কথা—আর্ত-আতুরের, দীন-দরিদ্রের সেবা। এই সেবা ছেড়ে কেন আমরা কেবল নিজেদের মুক্তির চেষ্টা করবো। এদের অভাব দূর করাই হবে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। দেখলেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, তাদের ঘর-বাড়ী নেই এবং অন্নের কোন সংস্থান নেই। এরা যুগ যুগ ধরে এই অবস্থায় পড়ে আছে—কষ্টে, অনাহারে গাছতলায় অথবা সামান্য কুঁড়ে ঘরে কোন রকমে দিনপাত করছে। এই ভাবে বংশ-পরম্পরাক্রমে এদের জীবন কেটে গেছে। এদের কথা কেউ ভাবেনি। স্বামীজীর স্পর্শকাতর মন এদের জন্য হাহাকার করে কেঁদে উঠলো। এদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে তিনি আমেরিকায় ধর্ম-মহাসম্মেলনে চলে গেলেন। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের সম্মুখে সগৌরবে ভারতের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিলেন। সর্বত্র সম্মান, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা পেতে লাগলেন। তাঁর মাধ্যমে আমেরিকা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় লাভ করলো। কিন্তু এইসব গুরুতর বিষয় চর্চা করতে করতে মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, "এখান থেকে আমার চোখের সামনে ভারতের কথা ভেসে উঠছে। ভারতের দরিদ্রদের কথা মনে উঠলে আমার মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। ঠাকুর বলেছেন 'যত্র জীব, তত্র শিব।' বিবেকানন্দ এই আদর্শকে পরিপূর্ণ ভাবে পালন করেছেন। বেদান্তের মহান্ আদর্শ অনুসারে জীবন

গঠন করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জনগণ বহুযুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসছিল। 'আমার ভাই, আমার রক্ত' বলে স্বামীজী তাদের আলিঙ্গন করলেন। তাদের দুঃখ-দৈন্য-অজ্ঞতা ঘুচাবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। সর্বপ্রকারের রুগ্ন, আতুর, দরিদ্রের সেবাকে তিনি বর্তমান যুগে মুক্তির পন্থা বলে ঘোষণা করলেন। জীব-সেবাকে দেব-সেবার পর্যায়ে উন্নীত করে তুললেন।

কিভাবে স্বামীজী আর্ত-আতুরের সেবার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন একটি ঘটনা থেকে তা বুঝা যাবে। কলকাতায় যখন ভয়ানক ভাবে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, দুরন্ত কাল ব্যাধি ভীষণ মূর্তি ধরে লোকক্ষয় করছিল, তখন তিনি নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে ছিলেন। কলিকাতার সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি স্থির থাকতে পারলেন না—পড়ে থাকলো তাঁর নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা। আর্ত-আতুরের দরদী বন্ধু এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী অবিলম্বে দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সে সময় লোক দলে দলে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আর তিনি নিরাপদ স্থান থেকে সংক্রামক ব্যাধির কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লাগলেন। এই সময় কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এই কাজের জন্য যে অর্থের দরকার হবে তা কোথায় পাওয়া যাবে? স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, যদি দরকার হয় তবে মঠের জন্য কেনা নতুন জমি বিক্রী করব। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের চোখের সামনে যন্ত্রণাভোগ করবে, আর আমরা মঠ করব! আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পূর্বের মতো আবার তরুতলে বাস করবো, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করব, কিন্তু জনসেবা করে যাব।

মানুষ বুঝল, এতদিন তিনি যে বেদান্ত প্রচার করতেন, কাজেও তিনি তাকে রূপ দিতে জানেন। তিনি মুখে যেমন বৈদান্তিক, কাজেও তিনি খাঁটি বৈদান্তিক। বাস্তবিকই তিনি বেদান্তের মহান আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, মানব-সেবার ব্যাপারে কোনদিন জাতিভেদ করা চলবে না।

দরিদ্র জনসাধারণ দিন দিন অবনতির নিম্নতম কূপে তলিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য দায়ী কে? স্বামীজী বলতেন, আমরা অর্থাৎ ভদ্র-শ্রেণীর লোকেরাই সেজন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমাদের উচ্চবংশীয় পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণকে পদদলিত করেছেন, তার ফলে ক্রমশঃ তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। এই অবিরত অবিচারে অত্যাচারে দরিদ্রেরা ক্রমশঃ ভুলে গিয়েছে যে তারা মানুষ। তাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেবার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যগণকে আহ্বান জানালেন।

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের বহুপূর্বে স্বামীজী তাদের আপন ভাই বলে প্রাণের আলিঙ্গন দিয়েছেন। ভারতে প্রবর্তিত বহুপুণ্যকর্মের তিনিই জনক। তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা না পেলে পরবর্তী যুগ অত সার্থক ও আন্তরিকভাবে জনগণের উন্নয়নের কাজে অগ্রসর হতে পারত না।

অনুশীলনী

১। 'এ তো গেল এক দিকের চিত্র'—এই চিত্রটি কি? আপন ভাষায় চিত্রটি অঙ্কন কর।

২। ঠাকুর কে? ঠাকুরের কোন্ বাণী বিবেকানন্দকে জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করিয়াছিল? স্বামীজী ভারতবর্ষের মানুষের কি অবস্থা দেখিয়াছিলেন?

৩। "কিভাবে স্বামীজী আর্ত-আতুরের সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, একটি ঘটনা থেকে তাহা বুঝা যাবে।" ঘটনাটি আপন ভাষায় বর্ণনা কর।

৪। দরিদ্র জনসাধারণের অসহায় অবস্থার জন্য স্বামীজী কাহাদের কেন দায়ী করিয়াছেন ?

৫। টীকা লিখ :—

হরিজন আন্দোলন, প্লেগ, ডোম, মঠ, ধর্ম-মহাসম্মেলন; মোক্ষ।

৬। বাক্য রচনা কর :—

আজন্ম তপস্বী, বেদান্তবাদী, জনহিতকর, আতুর, অশন-বসন, উপলব্ধি।

৭। পদান্তর কর :—

অবতীর্ণ, সামঞ্জস্য, উৎসাহিত, স্পষ্ট, দরদী।

৮। নিম্নরেখ শব্দগুলির কারক ও বিভক্ত নির্ণয় কর :—

(ক) স্বামীজী তাদের আলিঙ্গন করলেন।

(খ) কলিকাতার সংবাদ পড়িবা মাত্র।

৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

বিবেকানন্দ, উন্নীত, উদ্ধার, প্রাদুর্ভাব, ধর্মোপদেশ, সম্মেলন।

১০। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—

সৃষ্টি, বিরাট, অকৃত্রিম, চঞ্চল, রুগ্ন, সংগ্রাম, পুণ্য।

মৌখিক প্রশ্ন

১। স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী তোমার মুখস্থ থাকিলে, আবৃত্তি কর।

২। বিবেকানন্দকে তুমি শ্রদ্ধা কর কেন ? তাঁহার মানসপুত্র কোন্ বিখ্যাত জননেতাকে বলা হয় ?

৩। দেশবিদেশের কোন্ কোন্ মনীষী স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন জান কি ? জানা না থাকলে শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন কর।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এবং জনদরদী বিবেকানন্দ
- স্বামী বিবেকানন্দের এই দুটি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] এই প্রবন্ধে।

বিনাতারে বার্তা প্রেরণ

—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য



আলোক বিনাতারে বার্তা বহন করে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিনাতারে কেন বার্তা বহন করিবে না ?

যে কৃত্রিম চক্ষু জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করিলেন, তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়িলে একটি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ তো কাঁটা না ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইতে পারে, বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইতে পারে। অধিকন্তু ইট-পাটকেলের মধ্য দিয়া যখন এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যায় তখন ঘরের দেওয়াল ভেদ করিয়া তো পার্শ্ববর্তী ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধাবিত হইতে পারে ; আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত কৃত্রিম চক্ষুতো খুবই কার্যকর, অতদূরে থাকিয়াও তো উহা সাড়া দিবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত হইল, মধ্যে দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছেন জগদীশচন্দ্রের পূর্বতন অধ্যাপক সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফোঁ ; ঘর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্তী অধ্যাপক পেডলারের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পৌঁছিয়া একটি পিস্তল ছুঁড়িল।

পৃথিবীতে বিনাতারে বার্তা প্রেরণের এই হইল সূচনা। এ বিষয়ে তিনি যে মার্কনির পূর্বগামী, তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার কাহিনী সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারিত হইল এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখাইলেন, তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দুইটি রুদ্ধঘর ভেদ করিয়া ৭৫ ফুট দূরে তৃতীয় ঘরে পৌঁছিল এবং সেখানে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ-স্তূপ উড়াইয়া দিল। ৭৫ ফুট দূরে পাঠাইতে তিনি তাঁহার যন্ত্রের সহিত একটি উচ্চদণ্ড সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই দণ্ডের উপরিভাগে একখণ্ড টিনের চাকৃতি আটকাইয়া রাখিলেন। বর্তমান যুগে পরিবর্তিত আকাশে এরিয়াল (aerial)এ এই ধরনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইবার তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এক মাইল দূরে তাঁহার বাসভবনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহাকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইল।

হার্জের পর পাশ্চাত্ত্য দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবার নানারূপ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র সবার শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ইলেকট্রিশিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হইল—

"বর্তমান সময়ে বিনাতারে বার্তাপ্রেরণ করিবার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে—জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত যন্ত্র তাহাদের সকলকে হটাইয়া দিল।"

এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার হেনরি জ্যাকসন ছিলেন তখন বৃটিশ রণতরীর অধ্যক্ষ। তিনি অনেকদিন হইতে ভাবিতেছিলেন কি করিয়া বিনাতারে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে সংবাদ পাঠানো যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার কথা অবগত হইলেন এবং তাহা কাজে লাগাইতে চেষ্টিত

রহিলেন। অবশেষে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা জাহাজের একধার হইতে অপরধারে সংবাদ পাঠাইলেন। মার্কনি প্রবর্তিত যন্ত্র ইহার পরে দেখা দিল।

১৮৯৭ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারীতে ইলেকট্রিক এন্‌জিনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হইল—

"যে সকল যুক্তির ধারা অবলম্বনে অধ্যাপক বসু—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন সেই যুক্তি এবং সকল যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক বসুর যন্ত্র যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, এই সত্য অতিশয় চমকপ্রদ। আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল তিনি কোনদিন লুক্কায়িত রাখেন নাই, এবং পৃথিবীর লোকের এই যন্ত্র কাজে লাগাইতে এবং তদ্দারা অর্থ-উপার্জন করিতে কোন বাধা নাই।"

ইহার পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অন্যদিকে চলিয়া গেল এবং তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীতে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সূচনা কে কেমন করিয়া কত সালে প্রথম করিয়াছিলেন, তাহা লিখ।

২। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যে রুদ্ধঘর ভেদ করিয়া যাইতে পারে, আচার্য জগদীশচন্দ্র তাহার প্রমাণ কেমন করিয়া দিয়াছিলেন?

৩। টীকা লিখ :—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জী, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেনরী জ্যাকসন, মার্কনি, ফাদার লাফোঁ, পেডলার, সেন্ট জেভিয়ার কলেজ।

৪। বাক্য রচনা কর :—উদ্ভূত, পর্যায়, মনস্থ, উদ্ভাবন।

মৌখিক প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কয়েকজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম বল।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র [illegible] পৃথিবীতে বিনা
তার- বার্তা প্রেরণের [illegible]



মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

প্রথম দৃশ্য

[মার্শাল সাহেবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর। সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় সবই কেতাবী, কখনও চলিত। দ স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণেরও দোষ আছে।]

বিদ্যাসাগর। আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি, বলুন।

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভায়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি? কত দিনের?

বিদ্যাসাগর। অন্ততঃ তিন-চার দিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব ; কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে ?

(বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন)

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজের একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, খুব জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। [বিস্মিত] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন ?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য করি না বটে, কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। কি এমন কাজ ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ। মা-বাবা যদি আপত্তি না করেন, তা হলে, এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও উত্তর দেননি।

মার্শাল। আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাক-যোগেই তো আপনি তাঁদের উত্তর পাইতে পারিবেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্য ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেইজন্যই ছুটি চাইছি।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

(বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘন্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন।)

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। উঠি তা হলে।

মার্শাল। আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত।

(বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।)

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাইবেন ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল। কি মুশ্‌কিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়। [হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল।

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে, সে নরাধম।

(চলিয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দামোদর-তীরে একটি খেয়া-ঘাট, ঘাটের নিকটে একটি কুটির রহিয়াছে। চতুর্দিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ু বহিতেছে, বায়ুবেগে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদরের গর্জন শোনা যাইতেছে, জনপ্রাণী কেহ নাই, দ্রুতপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তারপর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কেউ কোথাও নেই দেখছি।

(কুটীর দেখিতে পাইয়া সেইদিকে গেলেন)

মাঝি, মাঝি, এরা সব কোথা ? মাঝি !

(ঝাঁপ খুলিয়া লোক বাহির হইল)

লোক। মাঝি ফিরতে পারে নি, মেঘ দেখছেন ?

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখছি, কিন্তু আমাকে এখনি পেরুতে হবে যে।

লোক। নৌকা নৈলে যাবেন কিসে চেপে ? ওপার থেকে নৌকাই আসে না। আর এমন ঝড়ে নৌকাই বা আসে কি করে ? মেঘ দেখছেন, দামোদরের ডাক শুনছেন ?

বিদ্যাসাগর। সব শুনছি। কিন্তু আমাকে পেরুতে হবে।

লোক। মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরলে তবে না পার হবেন, সে আজ আর ফিরছে না।

(বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন, লোকটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।)

লোক। ওই পাগল বটে নাকি ?

(ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল)

তৃতীয় দৃশ্য

[বীরসিংহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর অভ্যন্তর। রাত্রি গভীর, চারিদিক নিষুপ্ত, কপাট জানালা সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে।

(নেপথ্যে) বিদ্যাসাগর—মা, মা !

[যে ঘরের জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, সেই ঘরের কপাট সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল, প্রদীপহস্তে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি যেন জাগিয়াই ছিলেন।

ভগবতী। ঈশ্বর, এলি বাবা ?

(আগাইয়া গিয়া বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে)

আমি জেগেই ছিলাম, আয় বাবা, আয়। বড় রাত করলি যে, সব তোর অপেক্ষায় থেকে চলে গেল।

(কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাপড় ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন।)

একি !

[বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন]

বিদ্যাসাগর (হাসিয়া)। দামোদরের ঘাটে মাঝি ছিল না, সাঁতরেই চলে এলাম।

ভগবতী। পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দেখি। আয়, কাপড় ছাড়, মাথাটা মোছ আগে।

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের যে পরিচয় আলোচ্য নাট্যাংশে পাওয়া গেল তাহা আপন ভাষায় লিখ।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মার্শাল সাহেবের যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখ।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :— যে সন্তান মায়ের……করে না সে নরাধম।

৪। টীকা লিখ :— ভগবতী দেবী, মার্শাল, দামোদর।

৫। পদান্তর কর :— পণ্ডিত, জিজ্ঞাসা, প্রশংসা, নিমন্ত্রণ।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— মহাশয়, ঘটাচ্ছন্ন।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :— অধম, পণ্ডিত।

৮। বাক্য রচনা কর :—ক্ষতি, কাজকর্ম, কপাট, প্রসাদাদি, মুসকিল।

৯। নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) মেঘ দেখছেন, দামোদরের ডাক শুনছেন।

(খ) আমাকে যেতেই হবে।

মৌখিক প্রশ্ন

১। ছদ্মনামে লেখেন এমন কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিকের নাম কর।

২। তুমি কি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছ ? কয়েকটি নাটক ও কয়েকজন নাট্যকারের নাম বল।

[illegible]



প্রবাসের পথে

অন্নদাশঙ্কর রায়

৭

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম। মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরবসাগর, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হ'য়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার ক'রে দিতে চলেছে।

জাহাজ টল্‌তে টল্‌তে চল্‌ল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্র-পীড়ার প্রথম তিনদিন আচ্ছন্নের মতো কাট্‌ল, কারুর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা-বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ কর্‌তে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ কর্‌তে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে প'ড়ে প'ড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ বা ভাবে মর্‌তে আর দেরী নেই। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা কর্‌তে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা,"—মাথার যন্ত্রণায় এমন

লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে।

সন্থ-দুঃখার্ত কেউ সঙ্কল্প ক'রে ফেল্লেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভাগ্য আর সইতে পার্‌বেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফির্‌তে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেল্লুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিতসাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হ'য়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটির ওপর মায়াও পড়ে গেছে, তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে, কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি নে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সঙ্কল্প দূর হয়ে যায়।

ডেকে চেয়ার ফেলে বসে কিংবা পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হ'য়ে যায়। চারদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প কর্‌তে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিতসাগরের পরে ভূমধ্যসাগর। দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘট্‌কালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড়-খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যার দ্বারা তা ঘট্‌ল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেন নি, লেসেপ্‌স তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, এইটুকুর জন্য ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আস্‌তে হতো। মিশরের রাজারা কোন যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখ্‌তে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটাতে গোটা কয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পারে কল্পনাটা অনেককাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হ'য়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি যাঁর প্রতিষ্ঠার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি লেসেপ্‌স একজন বিশ্বকর্মা ; তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। কেনালটি যেখানে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে নাম পোর্টসৈয়দ।

পোর্টসৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। অধিকাংশকে মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্টসৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স্ পর্যন্ত জল আর দুটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার কিছুই নেই। প্রথমটি ইটালী ও সিসিলীর মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুইধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ট্রম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্স্ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর।

মার্সেল্স্ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাট্‌ল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার, ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

অনুশীলনী

১। লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের, ভারত হইতে লণ্ডন পর্যন্ত সমুদ্রপথ ভ্রমণের বিবরণ আপন ভাষায় দাও।

২। জাহাজে সমুদ্রপীড়ায় যাত্রীদের দুর্দশা বর্ণনা কর।

৩। টীকা লিখ :—

স্বয়েজ, লেসেপ্‌স্, পোর্টসৈয়দ, রাবণের চিতা।

৪। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) ভারতবর্ষের মাটির উপর থেকে পা তুলে নিলুম।

(খ) সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫। বাক্য রচনা কর :— গোষ্পদ, হৃদয়, স্পন্দন, স্থপতি, গ্রীষ্মযাপন, ভুক্তভোগী।

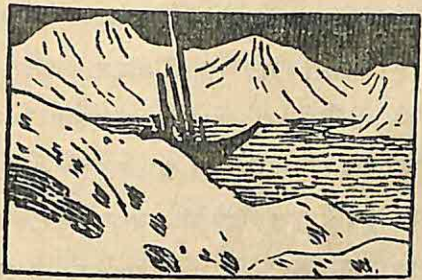
মৌখিক প্রশ্ন

১। তুমি কি কখনো জাহাজে চড়িয়াছ? চড়িলে সেই চড়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

২। আমাদের দেশের আর কোন্ বিখ্যাত লেখক জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণ করিয়াছেন?

৩। কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর নাম বল।

পথে প্রবাসে (লেখক অন্নদাশংকর রা



একটি দুঃসাহসিক অভিযান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু। চির তুষারের অগম্য মৃত্যু-শীতলতার রাজ্য। তবু মানুষ মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বার বার অদম্য উৎসাহে সেখানে পাড়ি দিয়েছে যথার্থ মেরু-বিন্দুতে পৌঁছোবার জন্যে। সেই অসাধ্যসাধন শেষ পর্যন্ত সম্ভবও হয়েছে। বহু করুণ ব্যর্থতার পর জয়যুক্ত হয়েছে মানুষের অভিযান। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন মেরু অভিযাত্রী রবার্ট এড্‌উইন পিয়ারি সুমেরু জয় করেন আর দক্ষিণ অর্থাৎ কুমেরু জয় করেন নরওয়েবাসী রোয়াল্‌ড আমুণ্ডসেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে।

এ সব মানুষ কি বিরলতম ধাতুতে যে গড়া, আর কি অবিশ্বাস্য তাঁদের সঙ্কল্পরক্ষার মৃত্যুপণ অনমনীয়তা, বৃটিশ মেরু অভিযাত্রী স্যার আর্নেস্ট হেনরি স্যাক্‌লটনের জীবনের একটি ঘটনাই তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

স্যাক্‌লটন দুই মেরুর কোনটিরই প্রথম বিজেতা নন। দুই মেরুর অজানা রহস্যের সন্ধানে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ মেরুর একটি নিষ্প্রাণ তুষার দ্বীপে কল্পনাতীত বিপদে পড়েছিলেন আটাশটি মানুষ। ইউরোপে তখন

প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। তার চেয়েও কঠিন সংগ্রামে এই কয়েকজন মেরু অভিযাত্রী প্রায় আঠারো মাস ধরে তখন লিপ্ত। তাঁরা দক্ষিণ মেরু প্রদেশের দু হাজার আটাশ কিলোমিটার সীমাহীন তুষার প্রান্তর পার হতে এসেছিলেন কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যও এসেছিল তাঁদের পিছু পিছু। পাঁচ মাস আগে তুষারস্তূপের চাপে তাঁদের জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ডুবে গেছে। যে ভাসমান তুষারখণ্ডে এতদিন বাস করেছেন, মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁদের শেষ তিনটি ছোট বোটে তাঁরা সে আশ্রয় ছেড়ে চিরতুষারের যে শ্মশান দ্বীপে উঠেছেন তাও তাঁদের ছাড়তে হবে। পেঙ্গুইনের মাংস আর সমুদ্রের শ্যাওলাই ছিল তাঁদের খাদ্য। সে খাদ্যের সঞ্চয় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তারপর বাধাশূন্য তুষার ভূমির ওপর প্রচণ্ড মেরুঝড় বইছে সারাক্ষণ।

এ সঙ্কটে তাঁদের সকলের দৃষ্টি তাঁদের নেতা আর্নেস্ট স্যাক্লটনের ওপর। রক্ষা যদি কেউ করতে পারেন তো তিনিই করবেন। তুষারময় এই মৃত্যুদ্বীপ থেকে সবচেয়ে কাছের ঘাঁটি এক হাজার পাঁচশ কিলোমিটার দূরের সাউথ জর্জিয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সমুদ্রে মোচার খোলার মত ছোট একটি বোটে অতদূর যাওয়ার কথা ভাবাই বাতুলতা। তবু পাঁচজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে শুরু হল পৃথিবীর সমুদ্র-যাত্রার ইতিহাসের তুলনাহীন একটি অধ্যায়,—প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম সংহারমূর্তির সঙ্গে মানুষের অপরাজেয় মনোবলের কঠোরতম এক সংগ্রাম।

বোট ছাড়বার সময়েই দুজনের প্রায় সলিল সমাধি হবার উপক্রম। নৌকোর গলুই গেল ফুটো হয়ে। শেষ পর্যন্ত যাত্রা যখন শুরু হল তখন নাবিকদের কারুর মনেই সাফল্যের আশা বিশেষ নেই। থাকবার কথাও নয়। যেখানে বাতাস মানে অবিরাম দুরন্ত ঝঞ্ঝাবেগ আর জল মানে চিরবিক্ষুব্ধ হিমশীতল অথচ উত্তাল তরঙ্গ-

দোলা, সেখানে মোচার খোলার মত একটা নৌকোর কতদূর কতক্ষণ পর্যন্ত যোঝা সম্ভব?

আশা যতই ক্ষীণ হোক যোঝার ব্যাপারে তাঁরা অকুতোভয়। হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামা রক্ত জমিয়ে দেওয়া শীত। হালীর শরীর গরম রাখবার জন্যে স্যাক্‌লটন কাছে বসে তাকে জড়িয়ে থাকেন। এই ঠাণ্ডায় নিজের গেঁটেবাতের অসহ্য যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করেন, সকলেরই হাত-পা ঠাণ্ডায় অসাড়। বোটের ক্যাম্বিসের ছাউনির ওপর পুরু হয়ে তুষার জমে যায়। তা কেটে না সাফ করলে তুষারের বোঝাতেই বোট ডুবে যাবে। দিনে তিনবার সেই তুষার কেটে সাফ করতে নাবিকদের প্রাণান্ত। চার মিনিটের বেশি কেউ বরফের কুড়ুল চালাতে পারে না।

সমুদ্রের এক একটা ঢেউ এমন পাহাড় প্রমাণ যে মনে হয় মাথায় আছড়ে পড়ে তা বোটটাকে নিমেষে একেবারে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবে।

তা না গেলেও প্রায় দুই সপ্তাহ বাদে স্যাক্‌লটন তাঁর ভাঙা জীর্ণ বোট আর ততোধিক ভেঙেপড়া কজন সঙ্গী নিয়ে যেখানে পৌঁছান সেটা সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের বসতিহীন বিপরীত দিক—দুরারোহ খাড়া পাহাড় আর বিপজ্জনক অজানা হিমবাহে একান্ত দুস্তর। তবু একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে স্যাক্‌লটন ছত্রিশ ঘণ্টা পরে দ্বীপের অপর দিকের তিমি ধরার ঘাঁটিতে উপস্থিত হন।

তিলে তিলে মৃত্যু প্রতীক্ষাই নিয়তি বলে যারা জানত, প্রায় পনের শ' কিলোমিটার দূরের তুষার দ্বীপে রেখে আসা মেরু অভিযানের সেই নাবিকেরা তাদের অদ্বিতীয় নেতার অতুলনীয় বীরত্বে ও বিচক্ষণতায় চার মাস বাদে সকলেই অবিশ্বাস্যভাবে উদ্ধার পায়।

অনুশীলনী

১। "দুই মেরুর অজানা রহস্যের সন্ধানে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি তাঁহাদেরই একজন।" কাহার কথা এখানে বলা হইয়াছে? তাঁর দক্ষিণ মেরুর অভিযান কাহিনী বর্ণনা কর।

২। সুমেরু ও কুমেরু কে কে কোন্ কোন্ সালে জয় করেন?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :—

এ সঙ্কটে তাঁদের……শ্যাকল্‌টনের ওপর।

৪। টীকা লিখ :—

এডউইন পিয়ারি, সাউথ জর্জিয়া, ক্যাম্বিসের ছাউনি, পেঙ্গুইন।

৫। বাক্য রচনা কর :—

মৃত্যুপণ, উৎসর্গ, সংহারমূর্তি, প্রাণান্ত, নিয়তি।

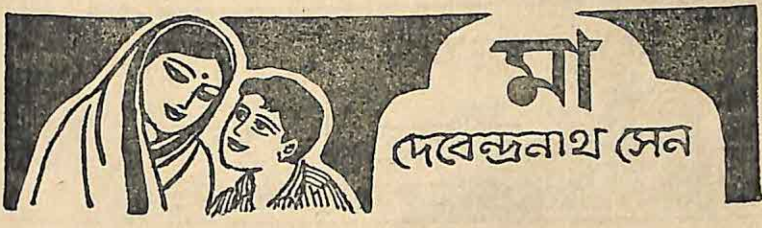
মৌখিক প্রশ্ন

১। মেরু, সমুদ্র ও পর্বতশৃঙ্গ ছাড়া মানুষ, আর কোথায় অভিযান করিয়াছে?

২। চন্দ্র অভিযানে কোন্ কোন্ দেশের মানুষ কত সালে সাফল্য অর্জন করিয়াছে?

৩। কোন বাঙালী অভিযাত্রীর নাম বলিতে পার?

[illegible]



মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া-ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে-কুঞ্জে; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর-গুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত; সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই, মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

অনুশীলনী

১। মাকে "সর্ব-তীর্থ-সার" বলা হইয়াছে কেন?

২। ব্যাখ্যা লিখ :—তবু ভরিল না চিত্ত!……এসেছি আবার।

৩। টীকা লিখ :—
বৈদ্যনাথ, গীত-গোবিন্দ, সীতাকুণ্ড, ত্রিবেণী-সঙ্গম, জানকী, পাণ্ডা।

৪। গদ্যরূপ লিখ :—
হেরিলাম, হেরিনু, নিরখিয়া, ভ্রমিলাম, বন্দিনু, আরোহিয়া।

৫। অর্থ সহ বাক্য রচনা কর :—পুলক, উতলা, চিত্ত, বর, সার।

মা যে সব তীর্থের সার তার প্রমাণ
আছে এই কবিতায়।



স্পর্শমণি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



নদীতীরে বৃন্দাবনে   সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেন কালে দীনবেশে   ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন,   "কোথা হতে আগমন,
কি নাম ঠাকুর ?"
বিপ্র কহে, "কী বা কব,   পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদূর ;
জীবন আমার নাম,   মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে,
এত বড়ো ভাগ্যহত   দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমি জমা আছে কিছু,   করে আছি মাথা নীচু,
অল্প-স্বল্প পাই।
ক্রিয়া-কর্ম-যজ্ঞ যাগে   বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি   শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।
একদিন নিশি-ভোরে   স্বপ্নে দেব কন মোরে—
পূরিবে প্রার্থনা।

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর,
ধরো দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি' মেনো তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।"
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
"কী আছে আমার,
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি—
ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে—
"ঠিক বটে ঠিক।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ-মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে,
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি,
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।

নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি,
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে", এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক।

অনুশীলনী

১। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবনের হৃদয়, সাধু সনাতনের সংস্পর্শে কেমন করিয়া পরিবর্তিত হইয়া গেল সেই কাহিনী লিখ। কবিতার মর্মকথাটি কি?

২। ব্যাখ্যা লিখ :—

ক) যাও যমুনার তীর······ধনের উপায়।

খ) যে ধনে হইয়া ধনী······ফেলিল মাণিক।

৩। টীকা লিখ :— বৃন্দাবন, সনাতন, শিব, মানকর।

৪। পদান্তর কর :—দীন, আরাধনা, ক্লান্ত, উন্নতি, চিন্তিত।

৫। গদ্যরূপ লিখ :—

জপিছেন, পূরিবে, ফুকারিয়া, মাগি, ভ্রমি, শুধালেন, কর।

৬। শব্দার্থ লিখ :—বিপ্র, শিব, নীর, ধাম, সার, নিশি, তট।

মৌখিক প্রশ্ন

১। স্পর্শমণির বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি মণির কোন্‌টির রঙ কেমন জানিলে বল।

২। সনাতন কে? তিনি কাহার শিষ্য ছিলেন?

বাঙলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন



মোদের গরব, মোদের আশা—আ-মরি বাঙ্‌লা ভাষা।
তোমার কোলে তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা॥
কি জাদু বাঙ্‌লা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনলো দেশে ভক্তিধারা;
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তিনাশা॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন
ঐ ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলে মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আসা॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকলাম মায়ে 'মা মা' বলে;
ঐ ভাষাতেই বলব হরি সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা॥

অনুশীলনী

১। আমাদের কাছে বাঙ্‌লা ভাষা এত প্রিয় কেন?
২। ব্যাখ্যা লিখ :— ক) ওই ভাষাতেই……নাশা।
খ) বিদ্যাপতি, চণ্ডী……যাওয়া আসা।
৩। টীকা লিখ :—বিদ্যাপতি, মধু, বঙ্কিম, রবি, চণ্ডী, নিতাই, গোরা।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বঙ্গভাষা সম্পর্কে আর কোন কবির কবিতা পড়িয়াছ কি?
২। অতুলপ্রসাদের রচিত সঙ্গীত তোমার কেমন লাগে বল।

কবি, এই কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি

বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কী সেবা তার সে সুখ-সদনে !—
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিংকরী ;
যোগায় অমৃতফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ;
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মকথা লিখ। কবি এখানে বিদ্যাসাগরকে "করুণার সিন্ধু" বলিয়াছেন কেন ?

২। ব্যাখ্যা লিখ :— বিদ্যার সাগর তুমি……কিরণে।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :— উজ্জ্বল, হেমাদ্রি, বনেশ্বরী।

৪। শব্দার্থ লিখ :— হেমাদ্রি, গিরীশ, কিংকরী, পরিমল, সদন।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কবিতাটি সনেট (চতুর্দশপদী কবিতা)। বাংলায় এর প্রবর্তক কে ?

আমার জন্মভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা—
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি !

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় এমন উজল ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে, উঠি পাখির ডাকে জেগে ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি !

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি !

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,—
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

অনুশীলনী

১। "আমার জন্মভূমি" বলিতে এখানে কোন দেশকে বোঝানো হইয়াছে? এই দেশটিকে কবি সকল দেশের সেরা কেন বলিয়াছেন?

২। কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য এই দেশটির আছে? তাহা কবিতাটি অনুসরণ করিয়া লিখ।

৩। গদ্যরূপ লিখ :— উজল, গাহে, গুঞ্জরিয়া, ধেয়ে।

৪। শব্দার্থ লিখ :— অলি, স্বপ্ন, বসুন্ধরা, তড়িৎ, হরিৎ।

৫। ব্যাখ্যা কর :—

ক) ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

খ) এমন দেশটি কোথাও........আমার জন্মভূমি।

৬। পদান্তর কর :—মধু, দেশ, স্নিগ্ধ, পুষ্প, ধূম্র।

মৌখিক প্রশ্ন

১। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি ও গীতিকার ছাড়া অন্য কোন পরিচয় তোমার জানা আছে? তুমি কি তাঁহার নাটকের অভিনয় দেখিয়াছ?

২। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী কবির নাম বলিতে পার?

৩। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক আর কোন কবিতা মুখস্থ আছে কি? থাকিলে আবৃত্তি কর।

একলব্য

—কাশীরাম দাস

অর্জ্জুনেরে সাথী করি' আচার্য তখন।
উপনীত হ'ল যথা নিষাদ নন্দন॥
একলব্য দ্রোণে দেখি' প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাঁড়াইল॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্য বশে।
কৃপা করি তুমি প্রভু এলে মম পাশে॥
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার।
যা কিছু আমার আছে সকলি তোমার॥
আজ্ঞা কর প্রভু করিলাম অঙ্গীকার।
প্রাণ যদি চাও দিব শ্রীপদে তোমার॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরু-আজ্ঞায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিল॥
তুষ্ট হইলেন গুরু আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥
একলব্য গুরুভক্তি দেখিয়া নয়নে।
স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥

অনুশীলনী

১। একলব্য কে? তাঁহার গুরুর নাম কি? তিনি কেন তাঁহার "বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি" গুরু দক্ষিণা স্বরূপ দান করিয়াছিলেন?

২। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর :— উপনীত, নিষাদ, কৃতাঞ্জলি।



অন্নদার আত্মপরিচয়

ভারতচন্দ্র রায়

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন্ গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই ॥

অনুশীলনী

১। অন্নদা কে? তিনি ঈশ্বরী পাটনীর কাছে কেমন ভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন?

২। গদ্যরূপ লিখ :—উত্তরিলা, জিজ্ঞাসিল, ডাকিলা, কহিবারে, দিলা।

৩। শব্দার্থ লিখ :—গাঙ্গিনী, ফেরফার, অহর্নিশ, শিরোমণি, তেঁই, বাম, কু-কথা, নিপুণ, দ্বন্দ্ব, বামাস্বর।

৪। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।

(খ) কু-কথায়……অহর্নিশ।

৫। পদান্তর কর :—ত্বরা, বিশেষণ, বৃদ্ধ, ভূত, বিষ।

৬। লিঙ্গান্তর কর :—পিতামহ, নারী, বধূ, স্বামী, ভাই, পতি।

৭। টীকা লিখ :— অন্নপূর্ণা, গঙ্গা, গোত্র, পাটনী।

মৌখিক প্রশ্ন

১। ভারতচন্দ্র কোন্ রাজার সভাকবি ছিলেন?

২। "বট" পঙ্ক্তিক্রিয়া—কোন্ অঞ্চলে ইহার ব্যবহার প্রচলিত?



দেশভক্তি

যোগীন্দ্রনাথ বসু

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো ? স্বদেশ জননি ।
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি ;
কিন্তু যবে অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন ।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল ?
পূত, শুদ্ধ কর মা গো দূর কর মনের জঞ্জাল !
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর—
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর ?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,—
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন ?
কোটি কণ্ঠে রোগ শোকে শুনি ওঠে তীব্র আর্ত্তনাদ—
আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা নাহিক বিষাদ ।
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয় ;
দেশভক্তি ত্যাগে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে,—বচনেতে নয় ।
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হ'য়ে গেছে প্রাণ,
কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ফূর্ত্তি, অন্তর্য্যামি ! কর মোরে দান ।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ !
সত্য সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ ।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি পড়িয়া প্রকৃত দেশভক্তি সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইল তাহা লিখ। প্রকৃত দেশভক্তি কিরূপ ?

২। ব্যাখ্যা লিখ :— (ক) সত্য দেশভক্তি······বচনেতে নয়।

(খ) বাক্যভারে······কর মোরে দান।

৩। অর্থ লিখ :—নিরীক্ষণ, অলীক, প্রবঞ্চক, বধির, কশাঘাত, আসন্ন, অকপট, লোর, নিমগ্ন।

৪। পদান্তর কর :— দারিদ্র্য, প্রজ্বালন, অবসন্ন, শুদ্ধ, অজ্ঞতা, অকপট, তীব্র, প্রবঞ্চিত।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— নিরীক্ষণ, পরমেশ, ভারাক্রান্ত।

৬। বাক্য রচনা কর :—

শূন্যগর্ভ, হাহাকার, বিষাদ, আর্তনাদ, অন্তর্যামী।

৭। লিঙ্গান্তর কর :— মা, ভ্রাতা।

৮। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :— স্বদেশ, শূন্য, বিষাদ, অকপট, অন্ধকার।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কবিতাটি ভালভাবে মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর। এ ধরণের আর কোন কবিতা পড়িয়াছ কি ? বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখিয়াছেন এরূপ কয়েকজন কবির নাম বলিতে পার ?

২। তুমি কি তোমার দেশকে ভালবাস ? ভাল বাসিলে বল কেন ভালবাস ?

জাতির পাঁতি

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম 'মানুষ' জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত ; একই রবি-শশী মোদের সাথী।
শীততাপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি, বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো, জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারই সমান রাঙা,
সবার ব্রতে যে সেবাই লেগেছে, লাগিছে, লাগিবে তুদিন পরে ;
মহামানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্ঘ্য রচনা করে।
মালাকার তার মাল্য যোগায়, গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে নৃত্যেগানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়, গোয়ালা যোগায় ছানা ও ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তারে করিছে ধনী।
যোদ্ধারা তার সাঁজোয়া পরায়, বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়, কিছু যেন জানা না রয় বাকি।
কেউ হেয় নয়, সমান সবাই, আদি জননীর পুত্র সবে ;
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে ?
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহ রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

অনুশীলনী

১। সমাজের ছোট বড় শিক্ষিত ও মূর্খ কিভাবে সকলেই মহামানবের সেবা করিতেছে, তাহা বুঝাইয়া লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

৩। টীকা লিখ :— মালাকার, নট, চন্দ্রকোণা, সাঁজোয়া।

ইমারতি-র বিভিন্ন বৃত্তির সংস্কৃতি-প্রবন্ধ টি

চাহিবে না ফিরে

—কামিনী রায়

পথে দেখে ঘৃণাভরে কত কেহ গেল সরে,
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি' বরষি' গঞ্জনারাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়ে যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে অসহায়,— পদে তারে দলে যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
বর্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেল আলো,—পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে তুলিবে না হাত ধ'রে,
অর্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদের হাত ধরি' হোক অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

অনুশীলনী

১। পতিত ও ব্যথিত মানবের প্রতি কর্তব্যের কি নির্দেশ কবি দিয়াছেন ?
২। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) বর্তিকা লইয়া হাতে……থামিবে না ভাই ?
৩। শব্দার্থ লিখ :—অশ্রুধার, বর্তিকা, পঙ্ক, নিরন্তর, গঞ্জনা।
৪। পদান্তর কর :—ব্যথিত, ঘৃণা, উপহাস, আলো, অর্থ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা কবির নাম বলিতে পার কি ?



ভোরের বেলায় পূব গগনে সূর্যিঠাকুর দেন উঁকি।
বলেন, অলস, জড়ের মতন ব'সে ব'সে ভাব্‌ছ কি ?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত উর্ধ্বে উঠি, ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এম্‌নি হবে, শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে সেথাই যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।
তোমার শক্তি-তপস্যাতে আসবে কাছে উর্ধ্বলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক।
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়,
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জ্জয়!
দেশের, জাতির লজ্জা, গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান,
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগ্‌বে বুকে নূতন প্রাণ।
যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আস্‌বে ছুটে, হে তেজোবীর, হে দুর্জ্জয়!
যে আদর্শ-মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।

সূর্য্য-সম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক্,
যুক্ত ক'রে বিশ্ব নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখ অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদ্‌বে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।

অনুশীলনী

১। মানব জীবন কেমন ভাবে সূর্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তাহা কবিতাটিকে অনুসরণ করিয়া লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ :— (ক) অস্ত গেলে……এই ধরায়।
(খ) তোমার শক্তি তপস্যাতে……দুঃখ শোক।

৩। শব্দার্থ লিখ :— ত্রিলোক, লহর, দুর্জ্জয়, ধরা, দ্যুতি।

৪। পদান্তর কর :— জড়, উচ্ছলতা, শৈশব, দুঃখ, কলঙ্ক, মাঙ্গলিক, জগৎ, অস্ত, শোক।

৫। বাক্য রচনা কর :— উঁকি, দিগ্বিদিক্, প্রখর।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—
উর্ধ্ব, সাঁঝ, আলোক, অসম্মান, মোচন।

মৌখিক প্রশ্ন

১। নজরুলের কোন কবিতা মুখস্থ থাকিলে আবৃত্তি কর। আর কোন বিখ্যাত বাঙালী মুসলমান কবির নাম জানা থাকিলে নাম কর।

২। নজরুলের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম বলিতে পার?

সূর্যের সঙ্গে জীবনের তুলনামূলক আলোচনা উল্লেখিত কবিতায় রয়েছে।



বুড়ীবালামের তীরে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'বুড়ীবালাম'-এর তীরে
বুকের শোণিতে যেদিন তোমরা রাঙালে ধরিত্রীরে,
সম্মুখ-রণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালে বীরের দল—
মৃত্যু সেদিন জ্বালালো শ্মশানে মুক্তির হোমানল।
নিজেরে সেদিন নিঃশেষ ক'রে বিলায়ে গেলে যে আলো—
সেই আলোকের রক্তশিখায় মিলায় রাতের কালো।
সেদিনের সেই মৃত্যুর দান সকল দৈন্য হরি'
নব জীবনের গরিমায় মরু তুলিছে শ্যামল করি।

আজি তোমাদের স্মরি'
নবীন-আশার কনক-কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি।
সারা তনু-মন ঝঙ্কার দিয়া গাহিতেছে অনুখণ—
'বাঘা যতীন্দ্র'—ছিল সে বাঙ্গালী,—ছিল 'মনোরঞ্জন',
'চিত্ত' 'নীরেন'—বাঙ্গালীর ছেলে! এই আকাশেরই তলে
প্রাণ তাহাদের উঠিল বিকশি হাসি ও অশ্রুজলে।
কে বলে এ দেশে মানুষ কেবল কল্প-কুঞ্জ-বাসী?
মোহনলালের অসির সঙ্গে চণ্ডীদাসের বাঁশী
মিশেছে এ দেশে,—খোলের সঙ্গে বাজে শাক্তের ঢাক,—
কোকিল-ডাকের সঙ্গে হেথায় গর্জে বাঘের ডাক,—
কপোতাক্ষীর সঙ্গে ছুটেছে ভীষণ পদ্মা নাচি—
ভোমরার সাথে বাঁধিয়াছে বাসা পাহাড়িয়া মৌমাছি,
বেণু রাগিণীর সঙ্গে নাগিনী ফণা নাচাইয়া খেলে,
শ্যামলা ধরার বুক চিরে, নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে।

কোমলে কঠিনে মেশানো এ মাটি,—তরুণেরা এই দেশে
বটের ছায়ায় বাঁশরি বাজায়, ফাঁসি কাঠে মরে হেসে।
জ্বালালে যে হোমানল—
শত শিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা-অম্বর-তল,
কুটিরে কুটিরে ছড়াবে আগুন ; সাঁজের আকাশ তলে
তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রুজলে।
পিতা শুনাইবে পুত্রেরে তার, ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে
কেমন করিয়া মরিলে তোমরা 'বুড়ীবালাম'-এর তীরে।
সেই মরণের অমর কাহিনী ছন্দে রচিবে কবি—
শিল্পী ফুটাবে চিত্রে বীরের শেষ-বিদায়ের ছবি,
চারণ গাহিবে পথে পথে সেই মৃত্যুর জয়গান,
সে গান শুনিয়া বক্ষে বক্ষে জাগিবে তরুণ প্রাণ।
'প্রতাপ', মোহন', 'সীতারাম' আর 'মীরমদনের' পাশে
রক্ত-আখরে তোমাদের কথা লেখা রবে ইতিহাসে।

অনুশীলনী

১। বুড়ীবালাম কোথায় ? সেখানে যে বীরের দল আত্মদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কর। তাঁহাদের আত্মদানের ফলে কি হইবে ?

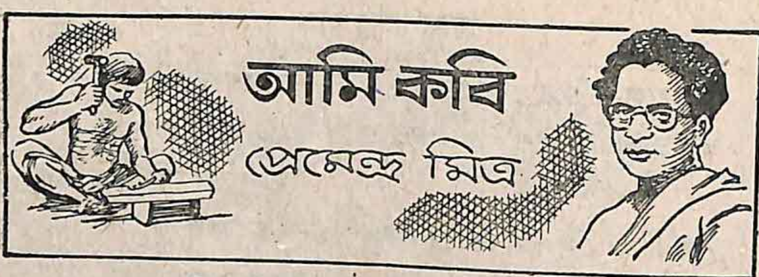
২। ব্যাখ্যা লিখ :— (ক) সম্মুখ রণে.........মুক্তির হোমানল।
(খ) কোমলে কঠিনে.........মরে হেসে।
(গ) প্রতাপ, মোহন.........রবে ইতিহাসে।

৩। টীকা লিখ :—বাঘা যতীন্দ্র, মোহনলাল, সীতারাম, প্রতাপ।

৪। শব্দার্থ লিখ :—অম্বর, শোণিত, ধরিত্রী, গরিমা, কনক।

মৌখিক প্রশ্ন

১। আর কোন কবির দেশপ্রেম মূলক কবিতা মুখস্থ আছে কি ? থাকিলে সেই কবিতা ও কবির নাম বল।



আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের।
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই।
মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল ;
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়!
মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা ;
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ!

পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় ;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
কুঠার-ঘায় ।
সারা ছুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি আর
খাল কাটি ভাই পথ বানাই ।

অনুশীলনী

১। কবি এখানে শ্রমজীবী মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া কেমন ভাবে তাহাদের কর্মের শরীক হইতে চান তাহা লিখ ।

২। কামার, কুমোর, কাঁসারি, ছুতোর, মাঝি, চাষী,—ইহারা প্রত্যেকে কিভাবে, কি উপকরণ লইয়া, কি ধরণের কাজ করে তাহা বর্ণনা কর ।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :— মাটি মাগে ভাই……বাঁধা যে পড়িতে চায় ।

৪। টীকা লিখ :— হল, তুরপুন, গুণ, হাল ।

৫। অর্থ সহ বাক্য রচনা কর :— দরিয়া, শাণিত, বিলাস-বিবশ, নিখিল মাধুরী ।

৬। গদ্যরূপ লিখ :— মাগিছে, নেহারি ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। সমাজের নীচের তলার মানুষদের নিয়ে কোন্ কোন্ কবি কবিতা রচনা করিয়াছেন জান কি ?

২। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির নাম জান কি ? জানিলে নাম বল ।



আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হ'তে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান—
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে—
দিল্ খোলা হই তাইরে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মেদুর,—
মধুর কথা বল্‌তে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর—
অন্তর হউক রত্ন-আকর।
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চল্‌তে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা;
আপন কাজে কঠোর হ'তে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
করুণা তার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,

শ্যাম-বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা ॥
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র।
নানান্ ভাবে নূতন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই ধরণীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখ্ছি সে-সব কৌতূহলে—
সন্দেহ নাই মাত্র।

অনুশীলনী

১। কবি বিশ্বকে পাঠশালা বলিয়াছেন কেন? কেন তিনি সকলের ছাত্র হইতে চান?
২। ব্যাখ্যা কর :— এই ধরণীর বিরাট খাতায়……নাই মাত্র।
৩। শব্দার্থ লিখ :— বনানী, দিবারাত্র, মৌন, মেদুর, অন্তর।
৪। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—উদার, দিবা, খোলা, মধুর, নূতন।
৫। পদান্তর কর :— সরসতা, মৌন, সহিষ্ণুতা, উদার, পাঠ।
৬। বাক্য রচনা কর :— মহান, দিলখোলা, মন্ত্রণা, দ্বিধা, আকর।

মৌখিক প্রশ্ন

১। শিশু-পাঠ্য কবিতা লিখিয়া নাম করিয়াছেন এমন কয়েকজন কবির নাম বলিতে পার?
২। নিম্নলিখিত কবিদের মধ্যে কাহার কবিতা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে? —যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু।

উড়ানির চর

—জসিমউদ্দীন

উড়ানির চর ধূলায় ধূসর যোজন জুড়ি'
জলের উপরে ভাসিছে ধবল বালুর পুরী।
ঝাঁকে বসে পাখি, ঝাঁক উড়ে যায়—
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়,
কিসের মায়ায় বাতাসের গায় পালক পাতি'।
মহা কলতানে বালুকার গানে বেড়ায় মাতি'।
উড়ানির চর উড়ে যেতে চায় হাওয়ার টানে;
চারিধারে জল করে ছলছল,—কি মায়া জানে!
জাঙ্‌লা ভরিয়া লাউয়ের লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি';
উড়ানির চরে ঝলমল করে কৃষাণ-পুরী।
উড়ানির চরে ছাড়-পাওয়া রোদ সাঁঝের বেলা—
বালু লয়ে তারা মাখামাখি করি, জমায় খেলা।
কৃষাণী কি বসে সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়?
কাশের মতন কুঁড়া উড়ে যায় আলোক-ধারে;
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে গাঙের পারে।

অনুশীলনী

১। উড়ানির চরের বর্ণনা দাও।

২। ব্যাখ্যা কর:— (ক) জলের উপর ভাসিছে ধবল বালুর পুরী।
(খ) লক্ষ্মী যেন সে দুলিছে দোলায়।

৩। বাক্য রচনা কর—ছল্-ছল্, মাখা-মাখি, জড়া-জড়ি, ঝল্‌মল্।

মৌখিক প্রশ্ন

১। জসিমউদ্দীনকে পল্লীকবি বলা হয় কেন?



বর্ষা সুন্দরী

মানকুমারী বসু

রাত দিন ঝম্‌ঝম্‌
রাত দিন টুপ্‌টুপ্‌,
কী সাজে সেজেছ, রাণি!
এ কী আজ অপরূপ!
আননে বিজলী-হাসি,
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—
এ আবার কী বাহার!
শিখী নাচে, ভেক গায়,
মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে
কত করে আয়োজন!
ডুবেছে রবির ছবি,
ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে
তরল রজত-ধারা।
জলদ বিজলী তা'রা,
এ উহার কর ধ'রে
চলেছে পিছল পথে,
পা যেন পড়ে না স'রে।
ভিজে গেল—ভেসে গেল—
ডুবে গেল ধরাখান,

গ'লে গেল, মেতে গেল
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।
প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে
কত কী যে মনে আসে।
সসীমে অসীমে আজ
হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন পর
চিনিনে সে দিবানিশি।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। বর্ষা সুন্দরী কবিতায় বর্ষার যে চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা আপন ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) আকাশ গলিয়া পড়ে তরল রজত-ধারা।
(খ) সসীমে অসীমে……দিবানিশি।

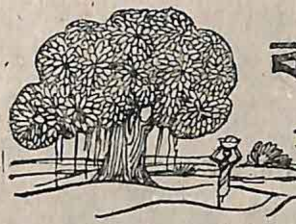
৩। গদ্যরূপ লিখ :— উথলিছে, ছেয়ে, ডুবায়ে।

৪। নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—
শিখী নাচে, ভেক গায়, মেঘে গুরু গরজন।

৫। পদান্তর কর :— তরল, আনন্দ, ক্ষুদ্র, সুন্দর, স্নেহ, প্রকৃতি।

মৌখিক প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কোন কবিতা তোমার মুখস্থ আছে কি? থাকিলে আবৃত্তি কর।



বাংলার পল্লী

সুকান্ত ভট্টাচার্য



এখানে বৃষ্টি-মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই তবু এখানে যে পথ হাঁটা।
এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস,
এ গ্রাম নূতন সবুজ ঘাগরা পরে।
রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য-শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা এখানে জড়ো করে জনমত।
দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে,
এগ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে,
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে !
রাত্রি হ'লেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে
কেমন করে সে আকালেতে গতবারে
চ'লে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।
এখানে সকাল ঘোষিত পাখীর গানে ;

কামার, কুমার, তাঁতী তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।
হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাহার পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে দেয় কোনমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণযুগ আসে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে গ্রামের চিত্রটি যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা আপন ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) রাত্রি এখানে স্বাগত......জড়ো করে জনমত।
(খ) সবুজ ফসলে স্বর্ণযুগ আসে।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— দুর্ভিক্ষ, স্বাগত, পরস্পর।

৪। টীকা লিখ :— ঘাগরা, ঢেঁকি।

৫। পদান্তর কর : সান্ধ্য, বিচিত্র, ঘোষিত, লাজুক।

৬। বাক্য রচনা কর :—বৃষ্টিমুখর, ইশারা, আল-পথ, আকাল, থম্‌কে।

৭। অর্থ লিখ :—ধ্বনি, সুবর্ণ, কৃষক-বধূ, মজা নদী, আকাল।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কবি সুকান্তের কোন কবিতা মুখস্থ আছে কি? থাকিলে আবৃত্তি কর।



বাগ্‌দাদ-পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
জীর্ণ-বসন শীর্ণ-শরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাস ভ্রমে একজন নাগরিক,
গৃহে ল'য়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক।
সপ্তাহ ধরি' বন্দী রাখিল অন্ধ-কূপের মাঝে,
অবশেষে তারে নিয়োজিল নিজ গৃহ-নির্মাণ কাজে।
রোদে পুড়ে' শীতে জমে', জলে ভিজে অবিরত দিনরাত—
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান শরীর করিয়া পাত!
আসল নফর ফিরিল, এদিকে আসিল বছর ঘুরে,—
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হ'য়ে যোড়হাতে কয় নাগরিক সদাগর—
"ক্ষমা কর মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?"
লোকমান কয়, "ওহে নির্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।
মম শ্রম-ফল হয় নি বিফল,—বছর তো গেল কেটে',
বহুজ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামী তোমার দুয়ারে খেটে'।
বুঝেছি সত্য, ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!

আমারও রয়েছে বহু দাস-দাসী, এমনি তো তাহাদের
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কত,—এখন পেয়েছি টের।
এ জ্ঞানের ভাগ কিছু লও তুমি, হয়ো নাক নির্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বাগ্‌দাদে এসে যে-জ্ঞান লভিনু সবচেয়ে তাহা দামী।”

অনুশীলনী

১। বাগ্‌দাদের নাগরিক লোকমান পণ্ডিতকে নিজের ক্রীতদাস ভ্রম করিয়া তাহার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিল ?

২। “বাগ্‌দাদে এসে যে জ্ঞান লভিনু সবচেয়ে তাহা দামী”। —কোন্ জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে ? কে এবং কিভাবে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিল ? এই জ্ঞান সবচেয়ে দামী কেন ?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :— গৃহে ফিরে মম……সবচেয়ে তাহা দামী।

৪। টীকা লিখ :— বাগ্‌দাদ, লোকমান পণ্ডিত।

৫। বাক্য রচনা কর :— ভ্রমণ, কুৎসিত, সুধী, অন্ততঃ।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— অত্যধিক, নির্মম, স্বাধীনতা, নির্দয়।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কবি কালিদাস রায়ের কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের নাম কর।

২। বাগ্‌দাদ কোথায় ? সেখানে কাহারা বাস করে ?

৩। কবি কালিদাস রায়ের অন্য কি পরিচয় তোমার জানা আছে তাহা বল।

পরিচিতি

গদ্য

নারী স্নেহের প্রভাব॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম—২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ ; মৃত্যু—২৯শে জুলাই ১৮৯১।] 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি। স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের ও সমাজ-সংস্কারের কাজে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দয়ারও তুলনা ছিল না। সেইজন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে মার্জিত করে নূতন রূপ দেন। সেইজন্য তাঁকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। তাঁর লেখা বই—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি। শিশুদের জন্য তিনি লিখেছিলেন—বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা, আখ্যান মঞ্জরী, বোধোদয় ইত্যাদি।

'নারী স্নেহের প্রভাব' কাহিনীটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসম্পূর্ণ আত্ম-চরিত থেকে সংকলিত।

অপরূপ অরণ্য॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [জন্ম—চব্বিশ পরগণার মুরাতিপুরে, মাতুলালয়ে, ১৮৯৪ ; মৃত্যু—ঘাটশিলায়, ১৯৫০]ঃ বিভূতিভূষণের সাহিত্যের প্রধান উপাদান নিসর্গ-চেতনা। প্রকৃতির রূপমাধুরী বর্ণনায় তাঁর নিজস্ব সাবলীল রচনা-রীতি অনুকরণীয়। 'পথের পাঁচালী'র লেখকরূপে বিশ্ববন্দিত হলেও তাঁর ছোটনাগপুর অরণ্য-অঞ্চলের আলেখ্য 'আরণ্যক'-এর তুল্য গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে বিরল। 'অপরূপ অরণ্য' সেই বিখ্যাত 'আরণ্যক' থেকে সংকলিত।

অনধিকার প্রবেশ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [আবির্ভাব কলিকাতার জোড়াসাঁকোয়, ৭ই মে, ১৮৬১ ; তিরোভাব ৭ই আগস্ট, ১৯৪১]ঃ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ। শুধু অজস্র কবিতা ও গান রচনাই করেননি, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকও বটে। তাঁর হাতেই বলতে গেলে বাংলা ছোট গল্প রচনার সূত্রপাত। চারিখণ্ড গল্পগুচ্ছে তাঁর গল্পগুলি সংকলিত হয়েছিল। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংগৃহীত।

বাংলার কৃষক ॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [জন্ম—চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায়, ১৮৩৮, মৃত্যু—১৮৯৪]ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস লেখকরূপে সম্মানিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেন। 'বাংলার কৃষক' নিবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত।

ভারতের বাণিজ্য ॥ স্বামী বিবেকানন্দ [কলিকাতার সিমলায় আবির্ভাব, ১৮৬৩ ; তিরোভাব—১৯০২]ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ কেবল অসাধারণ ত্যাগী, কর্মী ও পণ্ডিত ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান স্বল্প হলেও আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁর বাংলা গদ্যের রচনা-রীতি আজ 'স্টাইল'-রূপে স্বীকৃত। 'ভারতের বাণিজ্য' নিবন্ধটি বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

জগতে ভারতের দান ॥ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [জন্ম—১৮৪৫ ; মৃত্যু ১৮৮৬]ঃ বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের' লেখকরূপে বিখ্যাত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি জাতীয় গৌরবোদ্দীপক প্রবন্ধাবলী রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। 'জগতে ভারতের দান' নিবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' থেকে সংকলিত।

ছাত্রের তপস্যা ॥ সুভাষচন্দ্র বসু [জন্ম ১৮৯৭—]ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্বত্যাগী সৈনিক সুভাষচন্দ্র যে বাংলা ভাষায় কত দক্ষ ছিলেন 'ছাত্রের তপস্যা' নিবন্ধটি তারই প্রমাণ। ছাত্রদের

কর্তব্য সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ তিনি দিয়েছেন আজও তা ছাত্রদের অবশ্য পালনীয়।

মুক্তিপথের অগ্রদূত॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে জন্ম ১৮৭৬ ; মৃত্যু ১৯৩৮] : বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, সারা ভারতের কথা-সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন। দেশ ও মানুষের প্রতি অনাবিল ভালবাসার স্বাক্ষর তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। 'মুক্তিপথের অগ্রদূত' নামে উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নামে বিখ্যাত উপন্যাস থেকে সংকলিত।

লবণ-সত্যাগ্রহ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [জন্ম ১৯১৭ ; মৃত্যু ১৯৭০] : বিভূতিভূষণ, তারশঙ্করের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁর লেখায় রাজনীতি ও সমাজ চেতনার ছাপ আছে। রচনারীতি হৃদয়গ্রাহী ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন।

জনদরদী বিবেকানন্দ॥ রেজাউল করিম [জন্ম ১৯০৪] : ইনি পেশায় ছিলেন অধ্যাপক। চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতিমান। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় দেশ ও সমাজ হিতৈষণা ও জাতীয় চরিত্র গঠন। "জনদরদী বিবেকানন্দ" নিবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন পত্রিকায় (১৯৬১) প্রকাশিত উক্ত শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

বিনাতারে বার্তা প্রেরণ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য [চব্বিশ পরগণার হরিনাভি গ্রামে জন্ম ১৮৮৩ ; মৃত্যু ১৯৬১] : বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় সহজ সুখপাঠ্য ভাষায় লিখে যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন—সেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে একই সারিতে এঁর স্থান। ব্যক্তিগত জীবনে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেও বাংলা সাহিত্যের একজন বোদ্ধারূপে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। উদ্ধৃত রচনাটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক 'আবিস্কারের কাহিনী' থেকে গৃহীত।

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ।। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) [জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারি। কলিকাতায় মৃত্যু হয়। জন্ম ১৮৯৯ —]ঃ শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে যে বিখ্যাত 'ত্রয়ী'—বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও বনফুল—বাংলা কথা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেন ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক, কবি ও নাট্যকার। 'বনফুল' এঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। উদ্ধৃত নাট্যাংশটি এঁর বিখ্যাত নাটক 'বিদ্যাসাগর' থেকে গৃহীত।

প্রবাসের পথে ।। অন্নদাশঙ্কর রায় [জন্ম উড়িষ্যায় ঢেঙ্কানল রাজ্যে ১৯০৪, বর্তমানে কলিকাতার বাসিন্দা]ঃ বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর ধারা অনুসরণ করে চলিত রীতিতে মননশীল রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক অন্নদাশঙ্কর। একাধারে ইনি কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও ছোট গল্প লেখক। বর্ণনাগুণে ভ্রমণ কথা যে কত মনোগ্রাহী হতে পারে এই সংকলনের 'প্রবাসের পথে' নামে উদ্ধৃতাংশটি তার প্রমাণ। এটি 'পথে প্রবাসে' নামে গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

একটি দুঃসাহসিক অভিযান ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র [জন্ম কাশীতে, ১৯০৪; কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা]ঃ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক। শিশু সাহিত্যিক রূপেও খ্যাতিমান। বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক রোমাঞ্চকর কাহিনীর প্রবর্তক। এঁর 'ঘনাদা' বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে দিয়েছেন 'শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক'।

কবিতা

মা ।। দেবেন্দ্রনাথ সেন [জন্ম ১৮৫৮; মৃত্যু ১৯২০]ঃ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলা অপরূপ ভাষায় বর্ণিত ও অপরদিকে নারীর মহিমা নানাভাবে অনুরণিত।

স্পর্শমণি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [জন্ম ১৮৬১ ; মৃত্যু ১৯৪১] : জগতের
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবিগণের অন্যতম। বাংলা ভাষায় কাব্য
রচনা করে বাংলা ভাষাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষার মর্যাদা দান
করেছেন। গীতাঞ্জলি, প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ
করে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 'স্পর্শমণি'
কবিতাটি তাঁর সুবিখ্যাত 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙলা ভাষা ॥ অতুলপ্রসাদ সেন [জন্ম ১৮৭১ ; মৃত্যু ১৯৩৪] : পেশায়
ব্যারিস্টার হলেও বাংলা সাহিত্যে অতুলপ্রসাদ কবিরূপে খ্যাতিমান।
গীতিকার ও সুরকার রূপেও সঙ্গীত জগতে তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর
ভক্তি ও প্রেমের গানগুলির মত স্বদেশপ্রেমমূলক গানগুলি আজও
আপন ঔজ্জ্বল্যে বিদ্যমান।

বিদ্যাসাগর ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত [জন্ম ১৮২৪ ; মৃত্যু ১৮৭৩] :
তৎকালীন হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। অসাধারণ প্রতিভাধর ও বহু
ভাষাবিদ কবি। খ্রীস্টান হয়ে বিলাত গমন করলেও মধুসূদনের
বাঙ্গালী ভাবটি কখনও নষ্ট হয়নি। ইনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে
বাংলা কাব্যজগতে প্রাণবেগের সঞ্চার করেন। বাংলার পয়ার শাসিত
ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি। সনেট বা
চতুর্দ্দশপদী কবিতা তিনিই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে প্রথম সৃষ্টি করেন।
"বিদ্যাসাগর" নামক সনেটটি তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' থেকে
সংকলিত।

আমার জন্মভূমি ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [জন্ম ১৮৬৩ ; মৃত্যু ১৯১৩] :
রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে বাংলা সাহিত্যে কবি, নাট্যকার ও
হাসির গানের কবি, গায়ক ও সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল খ্যাতিমান।
পেশায় ইংরাজ আমলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বিলাত ফেরৎ হলেও
এঁর স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা ও গান দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিল।

একলব্য ॥ কাশীরাম দাস : মহাভারতের বাংলা অনুবাদকরূপে কবি
কাশীরাম দাসের নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। ইনি ছিলেন

দেব পদবীধারী কায়স্থ। বর্ধমানের সিঙ্গিগ্রামে সপ্তদশ শতকের প্রথম-দিকে জন্মগ্রহণ করেন। পয়ারছন্দে রচিত 'একলব্য' নামক কাহিনী-মূলক কবিতাটি 'মহাভারত' থেকে গৃহীত।

অন্নদার আত্মপরিচয়।। **ভারতচন্দ্র রায়** [জন্ম হাওড়ার পেঁড়োতে, ১৭১২ ; মৃত্যু ১৭৬০]: নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবিরূপে কাব্যরচনা করে 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন। ইনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। এঁর কবিতার ভাষার লালিত্য, ছন্দের নৈপুণ্য ও অনুপ্রাসের ঝঙ্কার বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিল। 'অন্নদার আত্মপরিচয়' নামক অংশটি ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্য 'অন্নদা মঙ্গল' থেকে গৃহীত।

দেশভক্তি।। **যোগীন্দ্রনাথ বসু** [জন্ম চব্বিশ পরগণার নিতাড়া ১৮৫৭ ; মৃত্যু ১৯২৭]: মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লিখে খ্যাতিমান হলেও কবিতা রচনায়ও দক্ষতা ছিল। স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ প্রমুখ মনীষিগণ প্রকাশ্য সভায় যোগীন্দ্রনাথকে 'কবিভূষণ' উপাধি দেন। তাঁর কবিতার মূল সুর দেশপ্রেমের।

জাতির পাঁতি।। **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** [জন্ম বর্ধমানের চুপীগ্রামে ১৮৮২ ; মৃত্যু ১৯২২]: নানাবিধ ছন্দ রচনা ও উদ্ভাবনে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা কাব্যজগতে তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। বিদেশী কবিতার অনুবাদেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েও প্রতিভাগুণে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। 'জাতির পাঁতি' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়ন থেকে সংগৃহীত।

চাহিবে না ফিরে।। **কামিনী রায়** [জন্ম ১৮৬৪ ; মৃত্যু ১৯৩৩]: অতি অল্পবয়স থেকেই কবিতা রচনা সুরু করেন। বি. এ. পাশ করে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করার সময় 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

হলে কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় একটা সকরুণ বেদনার সুর ধ্বনিত।

জীবন ও সূর্য ॥ কাজী নজরুল ইসলাম [জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া ১৮৯৯; মৃত্যু ঢাকা, ১৯৭৬]: প্রাণাবেগে ভরপুর নানা বিচিত্র ছন্দে কাব্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাবের জোয়ার আনেন। দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে বাল্যজীবন। তারপর কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক। কখনও বা কেটেছে বিদেশী শাসকের কারাগারে দেশকে ভালবাসার অপরাধে। খ্যাতি, যশ, অর্থ কিছুর অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বসন্ত'। অসুস্থ হয়ে দীর্ঘকাল নীরব হয়ে থেকেছেন। তারপর বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে জীবনাবসান ঘটেছে।

আমি কবি ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র [জন্ম ১৯০৪]: বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক। এঁর কবিতায় আছে সুতীক্ষ্ণ মননদীপ্ত আবেদন ও বক্তব্য উপস্থাপনের অভিনবত্ব। কাব্য রচনার জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র ও অ্যাকাডেমী পুরস্কার।

বুড়ীবালামের তীরে ॥ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় [জন্ম কৃষ্ণনগর ১৮৯৯; মৃত্যু, ১৯৭৪]: কবি ও সাংবাদিক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে বাংলার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গাবার ব্রত নিয়েছিলেন। এই জন্য রচনা করেছেন দেশপ্রেমোদ্দীপক গান ও কবিতা। এই জন্য তাঁকে বলা হ'ত "চারণ কবি"। এঁর কবিতায় তারুণ্য শক্তিকে জাগ্রৎ করার উদ্দাত্ত বাণী ধ্বনিত।

সবার আমি ছাত্র ॥ সুনির্মল বসু [জন্ম ১৯০২; মৃত্যু, ১৯৫৭]: বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক। আজীবন ছোটদের জন্য লিখে গেছেন গল্প, কবিতা ও ছড়া। সম্পাদনা করছেন কিশোর

পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া'। এঁর কবিতা এক সতেজ আনন্দ ধারার মত উৎসারিত হয়ে শিশুচিত্তকে কত সহজেই না উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে।

উড়ানির চর।। জসিমুদ্দীন [জন্ম ১৯০৩ ; মৃত্যু, ১৯৭৬]: পল্লী-কবি রূপেই জসিমুদ্দীনের পরিচয়। বাংলাদেশের গ্রামের সন্তান জসিমুদ্দীন বঙ্গ প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলা তাঁর কাব্যে সহজ, সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আজ উভয় বাংলার অগণিত মানুষ তাঁর কবিতার ভক্ত।

বাংলার পল্লী।। সুকান্ত ভট্টাচার্য [জন্ম ১৯২৬ ; মৃত্যু ১৯৪৭]: অকালে অবসিত জীবন এই কবির রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। জীবন দীর্ঘ হলে মনে হয় এঁর সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণতা ও গভীরতা আসত। তা সত্ত্বেও স্বল্পায়ু এই কবি বাংলা সাহিত্যে এক সুপরিচিত নাম।

বর্ষাসুন্দরী।। মানকুমারী বসু [জন্ম—১৮৬৩ ; মৃত্যু ১৯৪৩]: বাংলাদেশের খ্যাতিমান মহিলা কাবদের অন্যতম। প্রায় ৬০ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে ভুবনমোহিনী ও 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

ক্রীতদাস।। কালিদাস রায় [জন্ম বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ১৮৮৯ ; মৃত্যু ১৯৭৫): কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ—কালিদাস রায় জন্মসূত্রে চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের বংশধর বলে বোধকরি তাঁর কাব্যে —বৈষ্ণবোচিত সারল্য ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। অল্প বয়সে 'কুন্দ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে—তাঁর কবিখ্যাতির সূচনা হয়। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন। 'পূর্ণাহুতি' কাব্য গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্রপুরস্কার।